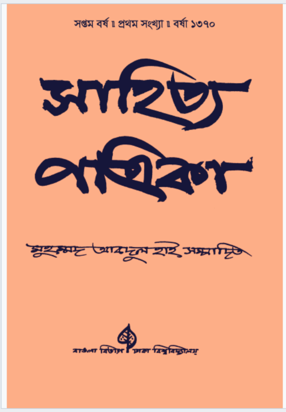

Vol. 7 | No. 1 | 1963

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

উদাসীন পথিকের মনের কথা

Volume	7
Issue	1
Year	1963
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মুনীর চৌধুরী
Published online	June 15, 1963
DOI	10.62328/sp.v7i1.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v7i1.5
Pages	133-154
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

উদাসীন পথিকের মনের কথা

মুনীর চৌধুরী

১.১ মীর মশাররফ হোসেনের আত্মজীবনীমূলক রচনা 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'য় দুই পৃথক দুনিয়ার বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। এক এলাকা ঘরের এবং পরিবারের, অন্য এলাকা বাইরের এবং পরিবেশের। এক জগতের কথা কিছু দূর পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা কোরে লেখক অন্য জগতের কথার অবতারণা করেন। কাহিনীর দুই ধারা কখনও পর পর কখনও পাশাপাশি এগিয়ে চলে। উভয় ধারার মধ্যেই আবার একাধিক স্বতন্ত্র প্রসঙ্গ বিদ্যমান। একশত আটানব্বই পৃষ্ঠায় সমাপ্ত এই গ্রন্থের রচনারীতির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হোলো এই যে, গ্রন্থকার নানা প্রকার মানুষের জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ ঘটনাবলীকে একটি কাহিনীর অংগে পরিণত কোরে সুকৌশলে গেঁথে তুলেছেন। উপন্যাস এ রকম না হয়ে উপায় নেই, কিন্তু আত্মজীবনীমূলক কাহিনীর মধ্যে এত বিভিন্নমুখী ঘটনাকে স্থান দেওয়া এবং সেই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যবিধান করা সামান্য কৃতিত্বের কথা নয়। অবশ্য এই চেষ্টা রচনাকে আত্মজীবনীর নিজস্ব এলাকার একনিষ্ঠ বাস্তবতা থেকে ক্রমাগত উপন্যাসের অতিযুক্ত কাল্পনিকতার দিকে টেনে নিয়ে গেছে। তাতে কিছু ক্ষতিও হয়েছে। সত্যকথন অবিমিশ্র হওয়ায় আত্মজীবনী হিসেবে এর মূল্য কমেছে, কল্পনা অবাধ হতে না পারায় এর গল্পরসে ঘাটতি পড়েছে। গ্রন্থকার নিজে যে আশঙ্কা অনুভব করেন, তার স্বরূপ আলাদা। তিনি ভেবেছিলেন যে, একাধিক প্রসংগের সম্মিলিত অবতারণার ফলে হয়তো কাহিনীর ধারাবাহিকতা ও বোধগম্যতা ব্যাহত হয়ে থাকবে। পঞ্চদশ তরংগে গ্রন্থকারের নিবেদন হোলো:

> পাঠক বিরক্ত হইবেন না। একটু ধৈর্য্য ধরিয়া পথিকের মনের কথা শুনিয়া যাইবেন। এ কথার বান্ধুনী, মিলগরমিলের দিকে আদৌ লক্ষ্য নাই।...যেখানে সন্দেহ, যেখানে গরমিল বোধ করেন, দয়া করিয়া নিজগুণে সংশোধন ও সংলগ্ন করিয়া লইবেন।

এই অনুরোধের আবশ্যকতা ছিল না। কারণ, 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' মূলতঃ সহজ ও সরল গল্প, কাহিনীর বুনটের মধ্যে জটিলতা কিম্বা গভীরতার বিশেষ প্রশ্রয় নেই।

১.২ 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'র একদিকে রয়েছে নীলকুঠির অত্যাচারী সাহেব টি. আই. কেনী, তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী দেশী জমিদার প্যারীসুন্দরী ও ভৈরব বাবু এবং নিপীড়িত চাষী। বইয়ের এই অংশের তারিফ সবচেয়ে বেশী শোনা যায়। শোষিত জনগণের জন্য লেখক যে গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেছেন, উৎপীড়িতের বিদ্রোহকে তিনি যে সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে দেখেছেন, অনেক আধুনিক পাঠক তা আবিষ্কার করে মুগ্ধ। উৎসাহের আতিশয্যে কেউ কেউ এমনও বলেছেন যে, 'বিষাদ-সিন্ধু' নয়, 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' নয়, 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'ই হোলো মীর মশাররফ হোসেনের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। আমাদের মতে উভয় সিদ্ধান্তই প্রমাদপূর্ণ। মীর মশাররফ হোসেনের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'বিষাদ-সিন্ধু'। অর্ধশত বৎসর ধরে শত সহস্র সাধারণ পাঠক যে সত্য নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণিত করেছে, জবরদস্তি তা অগ্রাহ্য করার মধ্যে কোনো রকম গবেষণামূলক গৌরব লুক্কায়িত থাকতে পারে, মনে করি না।

মীর-মানসের গণ-দরদী জীবনদৃষ্টির যে প্রশস্তি গতানুগতিক সমালোচনায় লক্ষ্য করি, তার মধ্যেও অনেক ফাঁকি রয়েছে। মীরের সমগ্র রচনাবলী মনোযোগ দিয়ে পড়লে অবশ্যই আমরা উপলব্ধি করতাম যে, সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে রোষ ও শোষিতের জন্য বেদনাবোধ মীর মশাররফ হোসেনের চিত্তে যত তীব্র তীক্ষ্ণ আকারই ধারণ করুক না কেন, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তার সঙ্গে যুক্ত থাকে ব্যক্তিগত আক্রোশ এবং বিলাতী সাহেব ও শাসনের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা। এক তরফা বন্দনায় না মেতে, সমাজ-সচেতন শিল্পীর এই দ্বিমুখী মনোভাবের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা বেশী জরুরী কর্ম। পথিকের অন্তর্দ্বন্দ্ব দিবালোকের মতো স্বচ্ছ। 'উদাসীনে'র সপ্তবিংশতি তরঙ্গে নীলকরের বিরুদ্ধে জাগ্রত জনতাকে অভিবাদন জানিয়েও লেখক হুঁশিয়ারীর সংগে উভয় কূল রক্ষা কোরে আনন্দ ও উষ্মা প্রকাশ করেছেন।

> হরিশের হৃদয়ভেদী বক্তৃতায় এবং পেট্‌রিয়টের সেই জ্বলন্ত ভাবপূর্ণ বাক্‌বিতণ্ডায় অনেক বংগভূষণের হৃদয় দুঃখে গলিয়া গিয়াছে। নীলকরের বিরুদ্ধে একটু

> উত্তেজিত না হইয়াছে তাহাও নহে। দীনবন্ধু দীনবন্ধুর মহামূল্য দর্পণখানি অনেকের ঘরেই উঠিয়াছে। ...... ভারতবন্ধু লং দর্পণখানি বেলাতি সাজে সাজাইতে গিয়া কারাবাসী হইয়াছেন। জরিমানার হাজার টাকা দাতা কালী সিংহ আনন্দ সহকারে দান করিয়া তঙ্জমাকারককে খালাস করিয়াছেন। মাননীয় হর্সেল বাহাদুর ভারতীয় সিভিল সার্ভিস আকাশে পূর্ণ জ্যোতি সহকারে, পূর্ণ কলেবরে পূর্ণচন্দ্ররূপে দেখা দিয়াছেন। প্রজার দুর্দ্দশা স্বচক্ষে দেখিতেছেন। এ প্রকার আর্ত্তনাদে বংগেশ্বরের আসন পর্য্যন্ত টলিয়াছে। মহামতী লাটবাহাদুর প্রজার দুরবস্থা, স্বচক্ষে দেখিবার জন্য সোনামুখী আশ্রয়ে মফস্বলে বাহির হইয়াছেন।

'উদাসীনে'র নীলকর সাহেব টিঃ আইঃ কেনী মহাপাপিষ্ঠরূপে চিত্রিত হয় নি। কখনও কখনও সেরূপ বিশেষণে ভূষিত হলেও নৃশংস আচরণের দ্বারা সে আমাদের ঘৃণা অর্জন করে না। যেটুকু করে, তাও প্রজাপীড়ক হিসাবে নয়, মুক্তহস্ত লম্পট হিসাবে। তার ঘোড়াদৌড়ান ও শিকারের মধ্যে, প্রতিদ্বন্দ্বী দেশী জমিদারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার মধ্যে, অর্থ ও পুরস্কার দ্বারা গাড়ওয়ানকে প্রলুব্ধ কোরে তার সুন্দরী স্ত্রীকে পোষ মানাতে সমর্থ হওয়ার মধ্যে যে শক্তি, দম্ভ ও দক্ষতার প্রকাশ রয়েছে, তা তাকে, দুর্বৃত্ত নয়, এক প্রকার নায়কে পরিণত করে। কেনী, উড-রোগের দোসর নয়, সে জবরানে ধোরে এনে চাষীবৌ ধর্ষণ করতে উদ্যত হয় না। কেনী ময়না পোষ মানাতে জানে। পথিক উড-রোগের যেমন সাক্ষাৎ লাভ করেন নি, তেমনি তোরাপকেও চোখে দেখেন নি। কেনীর বিপক্ষ শক্তির মধ্যেও যাঁরা প্রধান, তাঁদের মধ্যেও কেউ বিন্দুমাধব-নবীনমাধবের মতো সর্বস্বত্যাগী আদর্শবাদী কিম্বা তোরাপের মতো শক্তিমান পুরুষ নয়। 'উদাসীন পথিকে' অত্যাচারী কেনী সাহসী এবং বুদ্ধিমান; তাঁর পত্নী সুন্দরী, স্বদেশানুরাগী এবং বুদ্ধিমতী; তাঁর দক্ষিণ হস্ত সাঁওতার মীর সাহেব ঘোর আমুদে। কুঠিয়ালের বিরুদ্ধে যাঁরা লড়েছেন, তাঁরা কেনীর সমকক্ষমাত্র, যেমন প্যারীসুন্দরী এবং ভৈরব বাবু। কৃষক নেতা সাগোলামও পারিবারিক জীবনে শ্বশুরের সম্পত্তি আত্মসাৎকারী, কেনীর কুঠি আক্রমণকারী লেঠেলরা অর্থলোলুপ। যদিও কৃষক সন্তানের দুঃখ-দুর্দশার অনেক কথাই বইয়ে স্থান পেয়েছে, তবু সমগ্র গ্রন্থের আবেদন পরীক্ষা করলে বুঝতে কষ্ট হয় না যে, এই জীবনপথিক নিজের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের ক্ষুদ্রায়তন লাভক্ষতির বাইরে অবস্থিত দেশ

বা জাতির বড় বড় সংগ্রাম ও সমস্যা সম্পর্কে অন্তরে উদাসীন ও নির্বিকার ছিলেন। 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' পাঠ কোরে জনৈক সমালোচক আত্মহারা হোয়ে ঘোষণা করেন যে, এই শিল্পী ছিলেন সত্যপ্রকাশে নির্ভীক, অত্যাচারীর প্রতি নির্মম এবং নির্যাতিত মানুষের প্রতি মমতাশীল। গ্রন্থের কোনো তরঙ্গই এই উচ্ছ্বাসের প্রমাণ বহন করে না। বরঞ্চ বলা চলে যে, শিল্পীর মানসদ্বন্দ্ব অত্যাচারীর প্রতি নির্মম হোতে তাকে পদে পদে বাধা দিয়েছে, একাধিক ব্যক্তিগত কারণে তাঁর গ্রন্থে সত্যের প্রকাশ অনেক স্থলে দ্বিধাগ্রস্থ হয়েছে। মীরের নীলচাষীদের মধ্যে একজন তোরাপও যে জন্ম নিতে পারল না, তার কারণ হোলো নির্যাতিত সাধারণ মানুষের প্রতি পথিকের স্বভাবজ ঔদাসীন্য। প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে আমরা এসব চিন্তার সূত্রনির্দেশক দৃষ্টান্তসমূহ ক্রমশঃ উপস্থিত করতে থাকব। আপততঃ শুধু 'আমার জীবনী'তে (১৩০৫) উদাসীন 'পথিকের মনের কথা' এবং "দীনবন্ধু দীনবন্ধু" সম্পর্কে গ্রন্থকার যে সকল ধারণাদি ব্যক্ত করেছেন, তার একটি নজীর উদ্ধৃত কোরে আমরা প্রসংগান্তরে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক। 'আমার জীবনী'তে বলা হয়েছে :

> দীনবন্ধু মিত্র নীলদর্পণে নীলকরের দৌরাত্ম্য অংশই চিত্রিত করিয়াছেন। পরিণাম ফল...(নীল বিদ্রোহ)...নীলকরের হস্ত হইতে রক্ষা পাইল। কি প্রকারে শান্তির বাতাস বহিল, প্রজারা আশ্বস্ত হইল, ব্রিটিশরাজ প্রতি কি প্রকারে ভক্তি শ্রদ্ধা বাড়িল, সে সকল বিষয় এক 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' ভিন্ন অন্য কোনো পুস্তকে নাই। দীনবন্ধু বাবু ইংরেজের ত্রুটি ইংরেজের কুৎসাই গাইয়া গিয়াছেন। ইংরেজের মধ্যে যে দেবভাব আছে, প্রজার প্রতি মায়া মমতা স্নেহ এবং ভালবাসার ভাব আছে, তাহা তিনি চক্ষে দেখিয়াও প্রকাশ করেন নাই। যে ইংরেজ জাতির নিমক রুটি খাইয়া বহুকাল জীবিত ছিলেন, যে ইংরেজের বেতনভোগী চাকর হইয়া আজীবন কাটাইলেন, উত্তরাধিকারীরাও সে ইংরেজ-প্রদত্ত টাকার উপস্বত্ব ভোগ করিতেছেন, কেহ কেহ ইংরেজের নুন নেমক এখনও খাইতেছেন, সেই ইংরেজের কুৎসা গান করিয়া তুশ' বাহবা গ্রহণ করিয়াছেন। এখন দীনবন্ধুর প্রেত আত্মা বাহবা ভোগ করিতেছেন. ইহাদিগকে কি বলা যায়? ইহারই নাম পাতফোঁড়—যে পাতে খান সে পাতেই ছিদ্র করেন। লবণ ফুটিয়া বাহির হইবে। —'আমার জীবনী', পৃ ১২২

'উদাসীন পথিকের মনের কথা'য় কুঠিয়াল সাহেব কর্তৃক প্রজা-নিপীড়নের এবং সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে সম্মিলিত জনসাধারণের ফরিয়াদের যে চিত্র

উপস্থিত করা হয়েছে, তার মধ্যে ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ ঘটে নি। অনেক সমালোচক এইসব স্থুল ঘটনাদির ঐতিহাসিকতা বিস্তৃত প্রমাণ-সহকারে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মীর মশাররফ হোসেনের পক্ষে এটা কম গৌরবের কথা নয় কারণ এই বইয়ে বর্ণিত বেশীর ভাগ ঘটনা ঘটে তাঁর জন্মের পূর্বে। মীর মশাররফ হোসেন সৈয়দ মীর মোয়াজ্জম হোসেনেরর দ্বিতীয় পক্ষের প্রথম সন্তান। উদাসীন পথিক পুরাতন প্রসঙ্গ কতটা ধারাবাহিক-ভাবে বর্ণনা করেছেন, তা সর্বত্র সুস্পষ্ট নয়। তবে সৈয়দ মীর মোয়াজ্জম হোসেনের দ্বিতীয় বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় গ্রন্থের দুই-তৃতীয়াংশের পর, ১৩৩ পৃষ্ঠায়। সে হিসাবে অবশিষ্ট পঁয়ষট্টি পৃষ্ঠায় আছে পথিকের ভূমিষ্ঠ হবার পরের প্রথম বারো চোদ্দ বছরের পথ চলার কাহিনী। পথিকের নিজের জবানীতে ঃ

> মনের কথা তায় আবার কানে শোনা। সে শোনাও সেই ছোট বেলায়। অসংলগ্ন, ভুল ভ্রান্তি হওয়াই সম্ভব। (পৃ ৭৪)

'আমার জীবনী'র পঞ্চম খণ্ডের ১৩৪ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে, পুজনীয়া জননী নীল বিদ্রোহের পরেই পীড়িত হন। বৎসরকাল যন্ত্রণা ভোগ কোরে দেহত্যাগ করেন। তখন মীর মশাররফ হোসেনের বয়স চোদ্দ, মহতেসামের চার, বজলাল হোসেনের দেড়। উদাসীন পথিকের মনের কথা প্রকাশিত হয় এই ঘটনার আরও ত্রিশ বছর পর। স্বভাবতই তেতাল্লিশ বৎসর বয়সে পথিক যখন তাঁর জন্মের আগের এবং অব্যবহিত পরের কয়েক বছরের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করতে বসলেন, তখন মনের কথামত না চলে উপায় কি সাধ্যমত মনগড়া কথা যে এড়িয়ে যেতে পেরেছিলেন, সেটাই মস্ত বড় কৃতিত্বের কথা। এ সব সত্ত্বেও আমরা মনে করি যে, 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'র শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ মীর-পরিবারের অন্দরমহলের এবং মীরের অন্তর্জীবনের সংবাদ, কেনীর জুলুম বা প্রজার প্রতিবাদের বিবরণ নয়।

২.১ 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'র কাহিনীর দ্বিতীয় স্তর আত্মজীবনী-মূলক। আমাদের মতে গ্রন্থের এই অংশই বেশী কৌতূহলোদ্দীপক। অনেক স্থলে সামান্য বিবরণও পথিকের মনের গোপন ইচ্ছা-অনিচ্ছার আবরণে বিজড়িত হয়ে প্রকারান্তরে শিল্পীর গহন মানসের উন্মোচনকেই সরস কোরে তুলেছে। মনের কথার আসল সংবাদ এখানেই প্রাপনীয়। মীর-মানসের শংকা ও সংকোচ, দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব, গর্ব ও লজ্জা, তাঁর জীবনের ঐশ্বর্য ও অভাব,

ঔদার্য ও সংকীর্ণতা, ঔদাসীন্য ও উৎকণ্ঠা, একান্তভাবে নিজের পরিবার ও পরিবেশে কি ভাবে অভিব্যক্তি লাভ কোরেছে বা অবদমিত হয়ে গুমরে মরেছে, তার এক জীবন্ত দলিল 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'। যে সকল কথা আপাতদৃষ্টিতে ঘরের নয় বাইরের, মনের নয় ঘটনার, সেখানেও পথিকের অন্তরংগ ভাবনা ও আত্মগত বিচার বিবরণকে নৈর্ব্যক্তিক হতে দেয় নি।

২.২ 'আমার জীবনী'র পঞ্চম খণ্ডের ১২৪ পৃষ্ঠায়, নিজের যে দুজন নিকট আত্মীয় নীল বিদ্রোহী প্রজার দলে মিশেছিলেন, তাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন। একজন হলেন মীর মহেব আলী। ইনি মীর মশাররফ হোসেনের পিতার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। অন্যজন সাগোলামাজ্জম, পিতৃব্যকন্যা শুকরণনেসার স্বামী। ফরিদপুরের গটির পীর বংশের সন্তান। জোলফেকার আলীর মৃত্যুর পর শুকরণনেসা পিতার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সৈয়দ মীর মোয়াজ্জম হোসেনের গৃহে কন্যাস্নেহে লালিতপালিত হয়। উদাসীন পথিক, পিতা সৈয়দ মোয়াজ্জম হোসেনকে বরাবর সাঁওতার মীর সাহেব বোলে উল্লেখ করেছেন। সাগোলামাজ্জম শুকরণনেসাকে গ্রহণ কোরে চাচাশ্বশুরের বাড়ীতেই ঘরজামাইরূপে বসবাস করতে থাকে। পথিকের মতে, ক্রমে চাচাশ্বশুরের সকল সম্পত্তি আত্মসাৎ করে। সে ঘটনা ঘটে অনেক দিন আগে। মীর মশাররফ হোসেনের তখনও জন্ম হয় নি, এমন কি তাঁর পিতামাতার বিবাহ তখন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় নি। কিন্তু পথিক সাধারণভাবে উদাসীন হলেও অবস্থাপন্ন গ্রাম্য পরিবারের পুরুষ হিসাবে জমিজমার শরিকীসত্ত্বের প্রশ্নে অতি সহজেই উত্তেজিত হয়ে পড়েন। তা সে কাসুন্দি যত পুরাতনই হোক না কেন। এই উত্তেজনা মীর-মানসের নানাবিধ দ্বন্দ্বের আদি কারণ। এটা সমাজ-সচেতনতার নামান্তর নয়।

'উদাসীন পথিকের মনের কথা'য় প্রজাপীড়নের মর্মন্তুদ চিত্র রচনা করা হয়তো গ্রন্থকারের মুখ্য অভিসন্ধি ছিল। কিন্তু পিতৃশত্রু সাগোলামাজ্জম উৎপীড়িতের নেতৃত্ব করেছিলেন, এইরকম লোকপ্রসিদ্ধি থাকায় লেখক উভয় সংকটে পড়েন। কেনী লেখকের আদর্শের প্রতিপক্ষ, কিন্তু সাগোলামাজ্জম ঘরের দুষমন। পথিকের মনের কথা গোপন থাকে নি। পিতৃস্বার্থের পরিপোষক শ্বেতচর্ম কেনীকে তবু সহ্য করা সম্ভব, কিন্তু জনসেবক হলেও যে সাগোলামাজ্জম সম্পত্তি দখলের প্রতিযোগিতায় পিতাকে পরাজিত করেছে, পুত্র পথিক তাকে বরদাস্ত করতে

পারে না। লেখক শুধু গোলামাজ্জমকে বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হন নি, মনের উত্তেজনা প্রশমিত করবার জন্য সমগ্র জামাই জাতির প্রকৃতি বিচার কোরে ছেড়েছেন :

> এক গাছের বাকল অন্য গাছে লাগে না। কলমের চারাও একেবারে খাঁটি ওৎরে না।......জামাই পরগাছা, জামাই কলমের চারা, এবং ব্যবহারের বাকল। হাল্‌্লার ঘষ মাজ, মিশিবার নহে। মিশিবে না। স্থূল কথা জামাই জেতেই বিশ্বাস নাই, তারপর আবার ভাইঝি জামাই।......জামাই পরের সন্তান, পররক্তে গঠিত, সুতরাং মনের ভাব ভিন্ন, স্বভাব ভিন্ন, হৃদয় ভিন্ন। সে বশে থাকিবার নয়।

২.৩ ঘটনা তো বটেই, মনও মনের কথাকে অকপট হতে পদে পদে বাধা দেয়। অনেক বাধার প্রতি পথিক উদাসীন থাকতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন, পারেন নি। কিছু কথা বলতে চান নি, কিন্তু বলে ফেলেছেন ; কোনো কোনো কথা বলতে চেয়েছেন, কিন্তু বলতে পারেন নি। যেমন, পিতা-প্রসঙ্গে। সন্তান হিসেবে পিতার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে পথিক বদ্ধপরিকর ছিলেন। নিজের পিতাকে কে হেয় প্রতিপন্ন করতে চায়? সমাজের সামনে নিজের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে হোলে পিতৃনামও শ্রীমণ্ডিত কোরে প্রচার করা আবশ্যক। মীরের সে কাণ্ডজ্ঞান ছিল। পিতা যে সুপুরুষ ছিলেন, বিখ্যাত বংশে জন্মেছিলেন, এসব কথা তিনি বলেছেন। কিন্তু মুশকিলে পড়েছিলেন পিতার স্বভাবের অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল দিক বর্ণনা করা নিয়ে। গ্রাম্য আভিজাত্যের কর্মক্ষম উত্তরাধিকারী-রূপে পিতা গানবাজনা ও মদমেয়েলোক সম্পর্কে অত্যধিক পরিমাণে উৎসাহী ছিলেন। পিতার এই পারদর্শিতায় পথিক একই সংগে লজ্জিত ও গর্বিত। সাঁওতার মীর সাহেব ঘোর আমুদে ছিলেন, এর চেয়ে কঠিন কথা উদাসীন পথিকের মনের আসে নি।

> মীর সাহেব গৌরবর্ণ, স্থূলকায়, চক্ষু বিস্ফারিত, ললাট বিশাল, মিষ্টভাষী, সরল প্রকৃতি, এবং ঘোর আমোদী।

প্রথম পত্নীর মৃত্যুর পর পিতা কিয়ৎপরিমাণে সংসার বিবাগী হয়ে পড়েন। দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করায় নিরুৎসাহ প্রকাশ করেন। এও এক প্রকার উদাসীন হওয়া। কিন্তু তাই বোলে জগতের সব ব্যাপার সম্পর্কেই যে উদাসীন হয়ে পড়েন, তা নয়। অন্দর ত্যাগ করে সদরেই পড়ে থাকেন, 'আমোদের অংগ কিছু বেশী করিয়াছিলেন'।

মীর সাহেব স্বয়ং সেতার বাজাইতেছেন, গোপাল ঢোলক বাজাইতেছে, দেশীয় নর্তকীদ্বয় নৃত্য করিতেছে। মহফেলের প্রায় সকলেই মনের আনন্দে আনন্দ-সাগরে হাবুডুবু খাইয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছেন। (পৃ ২৯)

দেবীপ্রসাদ দ্বিতীয় বিবাহের ঘটকালী করতে এসেছিল। সাঁওতার মীর সাহেব তার বিপক্ষে যে সকল যুক্তি উথাপন করেন, তার মধ্যে পথিক ও পথিকের পিতা, উভয়ের স্বভাবই প্রতিফলিত হয়েছে। উভয়ের বললাম এই জন্যে যে, দাম্পত্যজীবন সম্পর্কে যে সারসত্য পিতার জবানীতে প্রকাশ করা হয়েছে, আসলে তা উদাসীন পথিকের দ্বারাই উদ্ভাবিত। সাঁওতার মীর সাহেব বলেন:

আবার!! জেনেশুনে, ভুগে, আবার!! যে নূতন সংসারী তার কাছেই সংসার সুখের। ভুক্তভোগীর নিকট অন্যপ্রকার। সে ফাঁদে আবার পড়িব? আমি স্ত্রী পরিবার এবং দুনিয়ার সুখ দুঃখ ভালভাবে ভোগ করিয়াছি। সন্তানের সাধ বিষয় সম্পত্তির সকলি মিটাইয়াছি। আমোদ আহ্লাদের সাধ মিটাইতেও কম করি নাই। আর কেন? অনেক হইয়াছে। বয়সের সংগে, শরীরের অবস্থার সংগে—সংসারীর অনেক কার্যে যোগ আছে। ...বয়সে কিছু করুক না করুক আমি আর এ ফাঁদে পা দিতে ইচ্ছা করি না। আমার গায়ে বাতাস লাগিয়াছে। (পৃ ৪৪)

পিতার সংগে কেনীর আঁতাতকে পথিক নানা সময়ে নানা ভাবে দেখেছেন। এই সম্পর্ক অনুমোদন করতে গিয়ে বাস্তব অবস্থার অনেক সুবিধা-অসুবিধার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে প্রয়াস পেয়েছেন। পিতার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম্পর্কে এক সম্পূর্ণ নতুন পূর্বপট কল্পনা কোরে প্যারীসুন্দরীকে দিয়ে বলিয়েছেন:

এই কুঠিরই একজন সাহেবকে সাঁওতার বড় মীর সাহেব কি করিয়াছিলেন মনে আছে? আজ যে মীর সাহেব কেনীর আজ্ঞাবহ সেই মীরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যে কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন, চিরকাল এ দেশে সাধারণের মনে সে কথা আঁকা থাকিবে। তাঁহার ক্ষমতাকে সহস্র ধন্যবাদ ... বড় মীর ঐ শালঘর মধুয়ার কুঠির একজন কুঠিয়াল সাহেবকে ধরিয়া দিনে দুপুরে তাহার একটি কান কাটিয়া লইয়াছিলেন। (পৃ ১৯-২০)

কেনীর দৌরাত্ম্যে টিকিতে না পারিয়া এ দেশের অনেকেই তাহার সহিত যোগ দিয়াছে. সত্যসত্যই কি তাহারা যোগ দিয়াছে? মনেও কোরো না। সে যোগ দায়ে পড়িয়া, সে প্রণয় না পারিয়া ... অপমানের ভয়, প্রাণের ভয়, স্ত্রী-পরিবারের প্রতি অত্যাচারের ভয় ভাবিয়া। (পৃ ৪১)

মীর সাহেব নিজেও, পথিকের মতে, মনে মনে প্যারীসুন্দরীকে শ্রদ্ধা করেন এবং নিজের সম্পর্কেও বিশ্বাস করেন যে, 'কি করিবেন দায়ে পড়িয়া কেনীর সহিত বন্ধুত্ব। নিজের সম্পত্তি রক্ষা করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য।' (পৃ ১৬)। পিতার দায় কত গুরুতর ছিল, তার স্পষ্টতর ধারণা, ইচ্ছে থাকলেও, পথিক পরিবেশন করতে পারেন নি। মনের কথাটি ব্যক্ত হয়ে পড়েছে।

২.৪ মীর মানসের সংকট গভীরতর আবর্ত রচনা করেছে মাতা-প্রসঙ্গে। সাঁওতার মীর সাহেব বোনের বাসায় কয়েকমাস কাটিয়ে, বোনের বিষয়াদি সুশৃঙ্খল কোরে দিয়ে বাড়ী ফেরা মনস্থ করেছেন। নৌকায় সিরাজগঞ্জ অঞ্চল থেকে রওনা হন। লাহিনীপাড়া গ্রামের ঘাট ছেড়ে সাঁওতার ঘাটের নিকটবর্তী হয়ে দেখেন ঘাটে বহু লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। এরা সব সাগোলামাজ্জমের লোক। জামাই চাচা-শ্বশুরকে ঘাটে নাবতে দিল না। পৈতৃক বাটী ও জমিদার, সমুদয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির অধিকার থেকে সাঁওতার মীর সাহেবকে সম্পূর্ণ বেদখল করা হোলো। 'তাঁহার চিরসাধের আশাতরী সোনার চাঁদ জামাই, তরবারী হস্তে আজ গৌরী গর্ভে ভাসাইয়া দিয়া সুস্থির হইলেন।' (পৃ ১৩৩) এর অল্প পর মীর সাহেব দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করেন। এই পত্নীর গর্ভে মীর মশাররফ হোসেনের জন্ম। পিতার এই বিবাহ সম্পর্কে গ্রন্থকার কোনো বিস্তৃত বর্ণনা দেন নি। যে কয়েকটি ছত্রে এই আকস্মিক সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে, তার সকল বাক্য সমপরিমাণে সপ্রকাশ নয়। হয়তো ঘোর সংসারীর মতো, উদাসীন পথিকের মনের কথাগুলি সর্বত্র প্রকাশ্য নয়। পথিক বলেছেন, সাগোলামাজ্জম কর্তৃক গৃহচ্যুত হবার পর পিতা 'প্রায় ছ'মাস নৌকায় নৌকায় থাকিয়া নানা স্থানে বেড়াইয়া নানা কারণে বাধ্য হইয়া সাঁওতার অতি সংলগ্ন লাহিনীপাড়া গ্রামে মুন্সী জিনাতুল্লার কন্যা বিবি দৌলতননেসাকে বিবাহ করিলেন। আবার সংসারী হইলেন।' এই দৌলতননেসাই উদাসীন পথিক বা আমাদের মীরের মাতা। গ্রন্থের ষড়বিংশ তরঙ্গ, ত্রয়োস্ত্রিংশ তরঙ্গ এবং পঞ্চত্রিংশ তরঙ্গে মাতার জীবনচিত্র রচনাই পথিকের মুখ্য উদ্দেশ্য। গ্রন্থের শেষ আট পৃষ্ঠা আমরা পড়তে পারি নি।

মাননীয়া দৌলতননেসা সম্পর্কে লেখক স্বীকার করেন যে, 'সে রূপের বর্ণনা করা পথিকের অসাধ্য।' তবু যতটুকু সাধ্য ছিল করেছেন। ধনদৌলত

ও রূপের চেয়ে দৌলতনেসার চিত্ত ও চরিত্রের বৈভব অধিকতর স্মরণীয়। তাঁর মত সৌভাগ্যবতী রমণী অতীতের ইতিহাসে, এমন কি সাহিত্যেও জন্মগ্রহণ করে নি। প্রভু মহম্মদের কন্যা, হাসান হোসেনের জননী বিবি ফাতেমা, মহা পবিত্রা এবং পুণ্যবতী। ইসলাম জগতে রমণীকুলের সর্বশ্রেষ্ঠ। সেই হিসাবে দৌলতনেসা তাঁর কিংকরীর কিংকরী। কিন্তু বিবি ফাতেমা পর্যন্ত কখনও কখনও সপত্নীবাদের ঈর্ষায় বিবি হানুফার নামে জ্বলে উঠতেন। পথিকের মতে দৌলতনেসার শরীরে 'সে মহাযাতনাসম্ভূত মহাবিষ' প্রবেশ করতে পারে নি। 'বদরুল আকবরির যুদ্ধের পর মদিনায় ফিরিয়া আসিতে মিথ্যাপবাদে কিছু দিনের জন্য' বিবি আয়েসা সিদ্দিকার মতো 'পবিত্র রমণীকেও স্বামীর অপ্রিয়পাত্র হইতে হইয়াছিল' কিন্তু 'পথিকের পূজনীয়া দেবী এক মুহূর্তের জন্য শত্রুমুখে কখনও অপবাদগ্রস্থ হন নাই।' 'রমণীপ্রধানা বিবি খদিজা' 'কয়েক স্বামীর পর' 'প্রভু মহম্মদকে' 'পতিত্বে বরণ করেন'। 'পথিকের পূজনীয়া দেবী এক স্বামীর পদ কায়মনে সেবা করিয়া, সেই স্বামীপদপ্রান্তে মস্তক রাখিয়া জগৎ কান্দাইয়া জগৎ হইতে চলিয়া গিয়াছেন।' ক্রমে পথিক মিশরের জুলেখা, ভারতরমণী নূরজাহান এবং বঙ্কিমের আয়েসার সংগে দৌলতনেসার তুলনা কোরে পূজনীয়া জননীকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করেছেন। 'কাজেই শেষ কথা, দৌলতনেসা পবিত্রা, মহা-পবিত্রা, দয়াবতী, পুণ্যবতী, এবং আজীবন চিরসতী'। মীর সাহেবের এই মাতৃ-বন্দনায় নিজের হৃদয়োচ্ছ্বাস কখনও সংবরণ করতে চেষ্টা করেন নি। জীবনে নয়, পুঁথির তুলনা নির্বাচন প্রণালীর অতিরঞ্জনকে অনুসরণ কোরে নিজের অপেক্ষাকৃত আধুনিক বিশ্বাস ও চিন্তাধারা অনুযায়ী ক্রমাগত অনুসন্ধানে রত হয়েছেন। মনের কথার চেয়ে তাতে মনোবাঞ্ছাই বেশী প্রকাশিত। বর্ণনাত্মক রচনায় প্রত্যাশিত সত্যসমাচার লেখকের ব্যক্তিগত আবেগ ও আকাঙ্ক্ষায় পরিমণ্ডিত হয়ে একপ্রকার ভাবাত্মক আত্মকথায় পর্যবসিত হয়েছে।

নারীজীবনের যে তিনটি সৌভাগ্য মীর-মানসে সর্বপ্রধান বোলে স্বীকৃত ছিল, সে হোলো, আজীবন চিরসতী থাকা, সন্তান-সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অধিকতর স্বামী সোহাগিনী হতে পারা এবং কখনও সপত্নীবাদের দ্বেষে পীড়িত না হওয়া। বিবি কুলসুমকেও মীর সাহেব এই সব গুণে ভূষিত করেন। 'বিষাদ-সিন্ধু'র সপত্নীদের মর্মান্তিক ক্রিয়াকাণ্ড কেবল শিল্পীর কল্পনাবলে সৃষ্ট হয় নি, মীরের শৈশবের স্মৃতি ও যৌবনের অভিজ্ঞতার মধ্যেও সে হলাহলের

অস্তিত্ব ছিল। এই বিশেষ বিকারের সত্য 'বিষাদ-সিন্ধু'তে যথার্থ শিল্পরূপ লাভ করেছে, একটা অপ্রতিরোধনীয় ট্রাজেডীর মূল মানবীয় কারণরূপে আমাদের বিশ্বাস উৎপাদন করতে সমর্থ হয়েছে। বহুপত্নী গ্রহণের জন্য পতি নিন্দিত হন নি এবং পতিহন্ত্রী পত্নীও পাপীয়সীরূপে চিত্রিত হয় নি। মনুষ্য-হৃদয়ের সামান্য বিকার পরিবেশের প্রতিকূল তাড়নায় কী ভয়ানক ক্রূরশক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে, জায়েদা তার শোকাবহ প্রতিমূর্তি। 'বিবি কুলসুম' লেখকের নিজের দাম্পত্যজীবনের অন্তরংগ কাহিনী। সেখানে 'বিষাদ-সিন্ধু'র শৈল্পিক নৈর্ব্যক্তিকতা অক্ষুন্ন রাখা সাধ্যাতীত ছিল। দ্বিতীয় পত্নীর প্রেমানুগত্য স্বীকার কোরে নিয়ে প্রথমার নির্মম সমালোচনা করেছেন। 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'য় পিতামাতার দাম্পত্য জীবনের সকল সত্য প্রকাশ করতে উদ্যত হয়ে লেখক বারবার দ্বিধা ও সংকোচ অনুভব করেছেন। পুরুষের পানাসক্তি ও রমণীপ্রীতিকে পথিক হয়তো পাপাচার বা অস্বাভাবিক আচরণ বোলে বেশী নিন্দা করার পক্ষপাতী ছিলেন না। অন্তত পিতা ও নিজের চরিত্রকে অনেকটা এই আলোকেই তিনি বিচার কোরে অভ্যস্ত। পত্নী কুলসুম কিন্তু স্বামীর এই পর্যায়ের উদাসীনতাকে ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখেন নি। পরিণত বয়সেও কেবলমাত্র সন্দেহের বশবর্তী হয়ে চেলা কাঠ দিয়ে প্রহার করবার জন্য গৃহের দাসীকে তাড়া করেছিলেন। উদাসীন পথিক একবার ভাবতে চেষ্টা করেছেন যে হয়তো মাতা অধিকতর উদারস্বভাব ও সহ্যশীলা ছিলেন। কল্পনা করেছেন ঃ

> দৌলতননেছা নিজ গৃহে শয়ন করিয়া আছেন। রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া যাইতেছে। মীর সাহেব আমোদ আহ্লাদেই আছেন। দৌলতন্নেসার কর্ণে গানের স্বর আসিতেছে, বাজনার শব্দ যাইতেছে। বামা কণ্ঠের মধুর ধ্বনিও সময় সময় প্রবেশ করিতেছে। নুপুরের ঝনঝনীও কানে লাগিতেছে—বাজিতেছে। যত রাত্রিই হউক স্বামীর সহিত দেখা হইলে, সেই বিশুদ্ধ ভাব, সেই বিশুদ্ধ প্রেম ভাব, সেই হাসি মুখে সেই মধুমাখা হাসি হাসি কথা।

> পাড়াপ্রতিবাসীরা সময় সময় অনেক কথা বলিত।......দৌলতনন্নেসা হাসিয়া বলিতেন ... ও গান বাজনা, নাচ ধরিতে নাই। ও বামাকণ্ঠে কোনো কুভাবের কোনো কারণ নাই, আর কারণ থাকিলেই বা কি? আমি ইহাই চাই আর ইহাই ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে তিনি সুখে থাকুন।

পথিকের মনে অন্য কথাও ছিল। জীবনের প্রকৃত অভিজ্ঞতা এত সরল প্রশস্তির প্রতি তাঁকে বেশীক্ষণ আস্থাবান রাখতে পারে নি। পিতৃচরিত্রের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হতে পারে এ আশংকাকে অগ্রাহ্য কোরে মীর সাহেব 'আমার জীবনী'তে মাতার মৃত্যুকালীন দৃশ্যের যে বর্ণনা দিয়েছেন, 'উদাসীন পথিকে'র বিবরণের সঙ্গে তার অনেক অমিল। 'আমার জীবনী'তে আছে যে মাতা মৃত্যুর মুহূর্তেও পিতার মুখ দর্শন করেন নি :

> মাতার মৃত্যুদিনের ঘটনা আমার স্মরণ আছে।...পিতা চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে কতক্ষণ পরে বলিয়া উঠিলেন।—আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি এখনও হইল না। আজ দুইটা বৎসর আমি তোমাকে দেখি নাই। তুমিও আমাকে দেখ নাই। অথচ এক বাড়ীতেই দুজন বাস করি।...তুমি তোমার মনের ঘৃণায় আমাকে ডাক নাই, আসি নাই। আমিও আমার মনের বলে..আসি নাই। আজ শুনিলাম তুমি সকলের মায়া মমতা ত্যাগ করে...মুখের আবরণ ফেলিয়া দেও—জনমের মত তোমাকে দেখিয়া যাই।...পিতা নীরবে দুই চক্ষের পানি ফেলিতে ফেলিতে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। জননী তাহা অনুমানে বুঝিয়া মুখাবরণ সরাইলেন। চক্ষে জলধারা। (পৃ ১৩৫—১৪৫)

'উদাসীন পথিকে'র মনের কথাকে আমারা এই দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার করতে চেয়েছি। সমকালীন সমাজে শাসক শোষিতের সম্পর্ক কি ছিল, তার এক বিশেষ এলাকার চিত্র পুংখানুপুংখ রূপে উদ্ঘাটন করা পথিকের একটি উদ্দেশ্য হলেও 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'র অপেক্ষাকৃত অধিক উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ মীর মশাররফ হোসেনের নিজের শৈশব ও পিতামাতার পারিবারিক জীবনের অন্তরংগ বর্ণনা। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা গ্রন্থের এই দ্বিতীয় দিক বিশ্লেষণ কোরে মীর-মানসের পূর্ণতর প্রতিকৃতি রচনা করতে প্রয়াস পেয়েছি। প্রবন্ধের শেষে, পরিশিষ্টে, অধুনা দুষ্প্রাপ্য 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'র মাতা-প্রসঙ্গ থেকে কয়েকটি বিস্তৃত অংশ মুদ্রিত হল।

পরিশিষ্ট

উদাসীন পথিকের মনের কথা

ষড়্বিংশ তরংগ

দৌলতননেসা

মাননীয়া দৌলতননেসা দেখিতে উজ্জল শ্যামবর্ণা মধ্যমাকৃতি। চক্ষু, নাসিকা ভ্রূ, ললাট নিখুঁত। সে পবিত্র রূপের বর্ণনা করা পথিকের অসাধ্য। অপরের সহিত তুলনা করিয়া দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বুঝাইয়া দিতেও অক্ষম। মুসলমান রমণী মধ্যে অনেক খুঁজিলাম, পাইলাম না। হয়ত এ কথায় পাঠক মাত্রেই উদাসীন পথিককে পাগল মনে করিতে পারেন। কি করিব। পথিকের চক্ষে যদি জগতের কোন রমণীকেই দৌলতন্‌নেসার সহিত তুলনা করিয়া দেখাইতে না পারে তবে সে কি করিবে? তবে কি উপমা রহিত? না তাহাও নহে। কিন্তু পথিকের চক্ষে বটে। এই সকল কথায় কোন পাঠক ক্রোধে জলিয়া পুড়িয়া যদি এই তরংগ পাঠ না করেন, আক্ষেপ নাই। কারণ জগৎ পরাধীন, মন স্বাধীন।

পথিকের চিন্তাপথে কতকগুলি মুসলমান রমণী আসিয়া বিশুদ্ধভাবে দাঁড়াইলেন। ইঁহাদের মধ্যে রাজকন্যা, মহামাননীয় বংশের অতি পবিত্র, সচ্চরিত্রা, দেবী সদৃশা, রমণীকুলের শিরোমণি মহোদয়াগণও রহিয়াছেন। মহামতি লেখকগণ হস্তে যিনি যে অবস্থায় যে প্রকার কল্পনায় চক্ষে পড়িয়াছেন উহার মধ্যে তাঁহারাও অনেকে রহিয়াছেন। কিন্তু পথিকের চক্ষের দোষে তাঁহাদিগকে যেন কেমন কেমন দেখাইতেছে। উপস্থিত রমণীগণ মধ্যে—পবিত্রা, অনেকেই স্বর্গীয়া রমণী সদৃশা। অনেকেই রূপে গুণে ভুবন বিখ্যাতা। কিন্তু সর্ব্ব বিষয়ে, সর্ব্বাংগিনী সুন্দরী বলিয়া বহু চেষ্টাতেও পথিক আপন মনকে সে কথা স্বীকার করাইতে পারিল না। সে মনে দৌলতননেসার রূপই যেন, জগতের আরাধ্যা, পথিক চক্ষে ঐ রূপই যেন সকল রূপের শ্রেষ্ঠা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সুতরাং তুলনা করিয়া পাঠকগণকে বুঝাইতে সক্ষম হইল না। তবে প্রাচীন কয়েকটি কথা শুনাইয়া উদ্দেশ্য সাধনে প্রয়াস পাইল বটে,

কিন্তু তাহাতে অনেকেই চটিতে পারেন। মহা নিন্দুক, মহাপাপী বলিয়া নানা প্রকার ভর্ৎসনাও করিতে পারেন—করুন পথিক তাহা সহ্য করিবে। কিন্তু কথা শুনাইতে ক্ষান্ত হইবে না। যাঁহার যেরূপ মনের গতি, এবং মাথার ক্ষমতা তিনি সেইরূপ বুঝিয়া লইবেন। যথা—

প্রভু মহম্মদের স্ত্রী, কন্যা, ইহাঁরা মহা পবিত্রা এবং পুণ্যবতী! দৌলতন্‌নেসা তাঁহাদের কিঙ্করীর কিঙ্করী! মুসলমান-জগৎ চক্ষে তাঁহাদের দাসীর দাসী। কিন্তু সপত্নীবাদে, হিংসার আগুণে তিনি মনে মনে জলিয়া পুড়িয়া খাক হইয়াছেন কিনা তাহা অন্তর্যামী ভগবান ভিন্ন মানুষে কখনই জানিতে পারে নাই। আকারে প্রকারে হাবভাবেও কখন সে ভাব কেহ দেখে নাই। তাহার সমুজ্জল দৃষ্টান্ত জলন্ত অক্ষরে পরে দেখাইব। আর একটি কথা।

প্রভু মহম্মদের কন্যা মহামান্য হাসান-হোসেনের জননী বিবি ফাতেমা যিনি ইসলাম জগতে রমণীকূলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সকলের মাননীয়া এবং আশ্রয়দাত্রী। তিনিও কিন্তু সপত্নীবাদ-মহানলকে হৃদয়ে আশ্রয় দিয়াছিলেন. সে মহাযাতনাসম্ভূত মহাবিষ সে পবিত্র শরীরেও প্রবেশ করিয়াছিল। পয়গম্বরের দুহিতা, এমামের জননী, মহাবীরের অঙ্কলক্ষী হইয়াও (হিংসার কল্যাণে) সে মহাবেগ হইতে মনকে রক্ষা করিতে পারেন নাই। অনেক সময় বিবি হনুফার নামে জলিয়া উঠিতেন।

পথিকের পূজনীয়া দেবী, এক মুহূর্ত্তের জন্য শত্রুমুখে, কখনও অপবাদগ্রস্ত হন নাই। সে মিথ্যাবাদে অতি অল্পকালের জন্যও স্বামীর মন হইতে সরিয়া যান নাই। ইহা কি কুলস্ত্রীর গৌরবের কথা নহে?—উদাসীন পথিকের কি গৌরবের কথা নহে?

বিবি আয়েসা সিদ্দিকা হজরাত মহম্মদের প্রিয়তমা স্ত্রী। শাস্ত্রে বলে হজরাত নূর নবী মহম্মদ, আয়েসা সিদ্দিকার বক্ষে পবিত্র মস্তক রাখিয়া জগৎ পরিত্যাগ করিয়াছেন। জীবনের শেষ সীমা, ভালবাসার সম্পূর্ণ চিহ্ন জগতে ভাল করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। সে সময় আয়েসা সিদ্দিকার বয়স সবে মাত্র ১৮ বৎসর ছিল। এত অল্প বয়সে পতি পরায়ণা পতিগতপ্রাণা ছিলেন! বনরুল আকবরীর যুদ্ধের পর মদীনায় ফিরিয়া আসিতে মিথ্যাপবাদে কিছু দিনের জন্য সে পবিত্র রমণীকেও স্বামীর অপ্রিয় পাত্রী হইতে হইয়াছিল।

রমণীপ্রধানা বিবি খদিজা প্রভু মহম্মদের প্রথমা স্ত্রী। কএক স্বামীর পর চল্লিশ বৎসর বয়সে হজরত মহম্মদের কার্য্যে ও বিশ্বাস গুণে বয়সের ন্যূনাধিক্য থাকা

সত্বেও যুবা মহম্মদকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। সে সময় প্রভুর বয়স ২৫ বৎসর। তখনও ধর্ম্মোপদেষ্টা বলিয়া আরব খণ্ডে পরিচিত হন নাই।

পথিকের পুজনীয়া দেবী আজীবন এক স্বামীপদ কায়মনে সেবা করিয়া, সেই স্বামী পদপ্রান্তে মস্তক রাখিয়া জগৎ কাঁদাইয়া জগৎ হইতে চলিয়া গিয়াছেন। ইহাও পথিকের কম গৌরবের কথা নহে।

অন্যরূপ চিত্র দেখুন। আফ্রিকা খণ্ডে নীলনদ-তীরে সুবিখ্যাত মিশর নগরের রাজমন্ত্রী আজীজ মেসেরের স্ত্রী, যাহার রূপ গুণের বর্ণনা পারসিক মহাকবি জামী মহোদয় সহস্র মুখে বর্ণনা করিয়াছেন। নাম জলেখা। তিনিও ধর্ম্মের মাথায় কুঠার মারিয়া পবিত্র প্রণয় বন্ধন ছিন্ন করিয়া, মহামতি ইউসুফের প্রেমে মজিয়া, রূপে মোহিতা হইয়া, রমণীকূলে কলঙ্করেখা পাতিয়া গিয়াছেন। ইউসুফের মন ভুলাইতে, কত যত্ন, কত চেষ্টা, শেষে 'হফ্‌ত খানা' (সপ্ততল বাসর) নির্ম্মাণ করিয়া নিজ মূর্তিসহ মানসাঙ্কিত নাগরের প্রেমভাব পূর্ণ, কুরুচি সম্পন্ন, নানাবিধ চিত্র, বিখ্যাত চিত্রকর দ্বারা চিত্রিত করিয়া ইউসুফের মন ভুলাইতে, প্রিয়দর্শনের হস্ত ধরিয়া চিত্রগুলি দেখাইয়া ছিলেন। মহাঋষির মন ভুলাইয়া কুপথে আনিতে কত প্রকার যত্ন করিয়াছিলেন। যাহার রক্ষক ঈশ্বর, তাহার মতিগতি ফিরাইতে সাধ্য কার? সে চিত্রে সে ভুলিল না। জলেখা মিথ্যা ভান করিয়া হৃদয়ের রত্ন —মহারত্ন— ... ... ইউসুফকে অযথা অপরাধী করিয়া বন্দিখানায় পাঠাইতে ত্রুটি করেন নাই। সুতরাং পথিক তাহা হইতে চক্ষু ফিরাইল।

ভারতরমণী নূরজাহান শেষে রাজরাণী। প্রথমে সের আফগানের মনোমোহিনী ছিলেন। আশ্চর্য্য পতিভক্তি! অনায়াসে স্বামীঘাতককে পতিত্বে বরণ করিলেন। রাজরাণী হইয়া আরও যশস্বিনী হইলেন। অকাতরে পতিঘাতকের ক্রোড়ে শয়ন করিয়া প্রেম বিতরণ করিলেন। ইহাতেও কি বলিব নূরজাহান রমণীরত্ন! রাজ-দৌরাত্ম ভয় অবশ্য ছিল, স্বীকার করি, কিন্তু স্বামী উদ্দেশ্যে প্রাণ বিসর্জন করিতে কি সে সময় কোন উপায় ছিল না? যাঁহার ইচ্ছা হয়, তিনি সৈনিক সীমন্তিনীর রূপ গুণের প্রশংসা সহস্র মুখে করুন কিন্তু উদাসীন পথিক যাহা ভাবিবার ভাবিয়া চক্ষু অন্যদিকে ফিরাইল। তৃতীয় চিত্র—কবিবর বঙ্কিম যে চক্ষে আয়েসার রূপ বর্ণনা করিয়াছেন, যে পজিসনে তিলোত্তমার ফটো তুলিয়াছেন। যে তুলিতে কুন্দনন্দিনীর শরীর আঁকিয়াছেন। এবং গুণাকর যে রুচি ও প্রবৃত্তিতে কুভাব সম্পন্না মালিনীর মুখে বিস্তার রূপ বর্ণনা করিয়াছেন, পথিক সে চক্ষু, সে পজিসনে, সে তুলি, সে রুচি, সে প্রবৃত্তিতে দৌলতন্নেসার রূপ বর্ণনা করিতে অক্ষম। কাজেই শেষ কথা

দৌলতন্‌নেসা পবিত্রা মহাপবিত্রা দয়াবতী পুণ্যবতী এবং আজীবন চিরসতী। সে পবিত্র পদই পথিকের মুক্তিপদ, পূজনীয় পদ। তুলনা করিবাই বা আর কি দেখাইবে? কাজেই নীরব। কাজেই সে কালের কথা, একালের কথা আপাততঃ এইখানেই শেষ। মনোযোগ করিয়া এখন মনের কথা শুনুন।

মীর সাহেব পৈতৃক বাড়ী বিষয় সম্পত্তি হইতে জামাইয়ের চক্রে অদৃষ্টের লিখায় বঞ্চিত হইয়াছেন। পথের ভিখারী হইয়াছেন। এই সকল ভাবিয়া দৌলতন্‌নেসা তাঁহাকে বিশেষ যত্ন ও আদরের সহিত সযত্নে স্বামীহস্তে পদসেবায় সর্বদা রত রহিয়াছেন। কোন কারণে তাঁহার মনে কোন রূপ কষ্টের কারণ না হয় তদ্‌প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছেন।

দৌলতন্‌নেসা নিজগৃহে শয়ন করিয়া আছেন। রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া যাইতেছে। মীর সাহেব আমোদ আহ্লাদেই আছেন। দৌলতন্‌নেসার কর্ণে গানের স্বর আসিতেছে, বাজনার শব্দ যাইতেছে। বামা কণ্ঠের মধুর ধ্বনিও সময় সময় প্রবেশ করিতেছে। নূপুরের ঝনঝনীও কানে লাগিতেছে—বাজিতেছে। যত রাত্রিই হউক স্বামীর সহিত দেখা হইলে, সেই বিশুদ্ধ ভাব, সেই বিশুদ্ধ প্রেম ভাব, সেই হাসিমুখে সেই মধুমাখা হাসি হাসি কথা।

পাড়া প্রতিবাসীরা সময় সময় অনেকে অনেক কথা বলিত। তোমারই বাড়ী, তোমারই ঘর, তোমারই বিষয়, তোমারই সকল। তুমি এক ঘরের একটি মেয়ে, তোমার আদরের সীমা নাই। আর তোমার স্বামী সর্বদা রংগ রসে আমোদে মত্ত। আমোদ চুলোয় যাক, মাঝে যে আবার কি ঘটনা। মীর সাহেবের এ নিতান্তই অন্যায়। তুমি কিছুই বলিতেছ না, কিন্তু ভাল হইতেছে না। শেষে বড় পস্তাইবে। দৌলতন্‌নেসা হাসিয়া বলিতেন। বাড়ী, ঘর, টাকা কাহার? বলত বন্‌। আপন জীবনই যখন আপনার নয়, এজগতই যখন চিরস্থায়ী নয় তখন গৌরব কিসের? তার পরে, তাঁহার সকলি ছিল। আমার সম্পত্তির চতুর্গুণ সম্পত্তি তিনি কিনিতে পারিতেন এত টাকা তাঁহার ছিল। না ছিল কি? সন্তান সন্ততী পরিবার সকলই ছিল। সংসারে লোকের যাহা চাই সকলি অতি পরিপাটিরূপে তাঁহার ছিল। সে সকল এখন নাই। আশ্চর্য্য কথা—তিনি সে সকল কথা লইয়া কোন দিন কোন কথা মুখে আনেন না। কিন্তু তাঁহার মনে যে কিছু না বলে এরূপ নহে। এখন ভাব দেখি বন্‌। তাঁহার মনে দুঃখ কত? ও গান বাজনা, নাচ ধরিতে নাই। ও বামাকণ্ঠে কোন কুভাবের কারণ নাই। আর কারণ থাকিলেই বা কি? আমি ইহাই চাই, আর ইহাই ঈশ্বরের নিকট সর্বদা প্রার্থনা করি যে তিনি সুখে থাকুন।

তাঁহার অসীম চিন্তা অন্তর হইতে দূর হউক, তাঁহার মনের দুঃখ ক্রমে উপসম হউক। তিনি যাহাতে সুখে থাকেন সেই আমার সুখ। প্রতিবাসীরা এই সকল কথা শুনিয়া অবাক হইয়া রহিত। কেহ বা রাগ করিয়া উঠিয়া চলিয়া যাইত।

ত্রয়স্ত্রিংশ তরংগ

ঘরের কথা

মীর সাহেব পুনরায় সংসারী হইয়াছেন। বিবাহ করিয়াছেন। শ্বশুরের অতুল ঐশ্বর্য্যে মহা সুখে কাল কাটাইতেছেন। ক্রমেই বয়স বেশী হইতেছে, পরমায়ু ক্ষয় হইতেছে, দেহকান্তি, গঠন, শরীরের অবস্থা দিন দিন পরিবর্ত্তন হইতেছে। কিন্তু আমোদ আহ্লাদ সর্ব্বদা হাসী খুসী, রংগ তামাসা, গান বাজনা ইত্যাদি যেমন তেমনই রহিয়াছে। মনে কি আছে ঈশ্বর জানে। প্রকাশ্য ভাব, মনের ভাব যেমন পুর্ব্বে ছিল, হাবভাবে বোধহয় যেন ঠিক সেইরূপই আছে। সাধারণ চক্ষে, দশ বছর পুর্ব্বেও যাহা এখনও তাহা। পূর্ব্বে স্ত্রীপুত্র বিয়োগের পরে যে ভাব,—জামাই কর্ত্তৃক পৈত্রিক সম্পত্তি, দালান, কোঠা, জমিদারী হইতে বঞ্চিত হইয়াও সেই ভাব, বর্ত্তমান সুখ সময়েও সেই একই ভাব। মীর সাহেবের মনের ভাব সুখে দুঃখে সকল সময়েই সমান। অতি দুঃখের সময় তাঁহার মুখে হাসির আভা সর্ব্বদা বিরাজ করিত। সাধারণ লোক সে কথা লইয়াও কতসময়ে কত আন্দোলন করিয়াছে। মীর সাহেব কি ধাতুর লোক সহজে কাহারও বুঝিবার সাধ্য ছিল না। কারণ সুখে দুঃখে সমান ভাব। অন্তরের অন্তঃস্থানের ভাব অন্তর্যামী ভগবান ভিন্ন অন্যের জানিবার সাধ্য ছিল না। বসীরুদ্দীন সাঁওতা ছাড়িয়া মীর সাহেবের অনুগ্রহ দৃষ্টিতেই চির আমোদের সহিত সংসার যাত্রা নিশ্চিন্ত ভাবে নির্ব্বাহ করিতেন। খানসামা বিরুদ্ধ বিদ্রোহী দলে সেই যে মিশিয়াছে, এখনও মিশিয়াই আছে। কিন্তু পূর্ব্ব মত আদর, ভালবাসা আর নাই। সাগোলাম এখন স্বয়ং মালিক।

মীর সাহেবও স্বয়ং মালিক। মুন্সী জিন্নাতুল্লার মৃত্যুর পর সমুদায় সম্পত্তি দৌলতন্‌নেসা ও তাঁহার মাতায় বর্ত্তিয়াছে বটে, কিন্তু মীর সাহেবই মালিক। মীর সাহেবের হস্তেই সম্পত্তি। নাম মাত্র তাঁহাদের।

সাগোলাম এবং মীর সাহেব উভয়ে নিকটেই বাস করেন। সাঁওতা লাহিনীপাড়া এ পাড়া। কিন্তু পরস্পর দেখা শুনা হয় না। দৈবাধীন দেখা হইলেও কথাবার্তা হয় না। উভয়ের চাকরে চাকরে, প্রজায় প্রজায়, অনুগত লোকজনের সহিত অনুগত লোকের

প্রায়ই ঝগড়া বিবাদ, বচসা হইয়া থাকে। কখনও লঘু কখনও গুরুতর গোছের হইয়া দাঁড়ায়। আদালত পর্য্যন্ত খবর হয়। উভয় পক্ষের লোকের জরিবানা, ফাটক হইতেছে, যাইতেছে, মিটিতেছে, আবার বাধিতেছে। কোন বিপদাপন্ন ব্যক্তি মীর সাহেবের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, তাহার পরামর্শমত চলিতে থাকিলে তদ্বিপরীত পক্ষ বাধ্য হইয়া সাগোলামের আশ্রয় লইতেছে। সাগোলামও যত্নপূর্বক গ্রহণ করিতেছেন। বলা বাহুল্য এখন মীর সাহেব কেনীর পক্ষে। দেশের লোকের বিপক্ষে।

মনের কথার মধ্যে ঘরের কথা। প্রয়োজনীয় এবং আবশ্যকীয়। এ কথা এত দিন চাপা ছিল। আবশ্যক না হইলে ঘরের কথা পরের কানে দেওয়ার ইচ্ছা পথিকের ছিল না। এখন বাধ্য হইয়া প্রকাশ করিতে হইল। ঘটনাস্রোতে বাধা দিতে কাহারও সাধ্য নাই। মানবীয় কার্য্যের আদি অন্ত মধ্যে মানুষেরই প্রয়োজন। কিন্তু সূত্রপাত হইতে শেষ পর্য্যন্ত ঘটনার মূলীভূত কারণ কি তাহা নির্ণয় করা কঠিন। বুদ্ধিমান, সকলেই জ্ঞানবান। জ্ঞান, বুদ্ধি পরাস্ত করিয়া ঘটনাস্রোত অবলীলাক্রমে কত জীবন ডুবাইয়া, কত জীবন্ত জীবন ভাসাইয়া ভাসাইয়া কোথা হইতে কোথায় লইয়া যাইতেছে। কোন বিষাদ সমুদ্রে ফেলিতেছে তাহা ভাবিতেও আশঙ্কা হয়।

মীর সাহেব জ্ঞানবান। পরিষদগণও অজ্ঞান নহেন। মাথার মজ্জা শরীরের রক্ত কাহারই তরল নহে। কেহই পাত্‌লা লোক নহেন। নূতন সংসারী নহেন নানা বিষয়ে পরিপক্ক। সকল বিষয়েই পাকা। এত পাকাপাকির মধ্যে এমন একটী কাঁচা কার্য্য হইতেছে যে তাহার আভাষে ইংগিতে, আকারে প্রকারে প্রকাশ করা ভিন্ন বিস্তারিত প্রকাশ করিতে পথিকের সাহস হইতেছে না। সেই বামা কণ্ঠই ঘটনার মূল। সেই নূপুর ধ্বনি সময়ে সময়ে যে দৌলত্‌ন্নেসার কর্ণে প্রবেশ করিত; সেই ধ্বনিই ঘটনার মর্ম্মগত আভ্যন্তরিক ভাব ও আভাষ। দৌলতন্‌নেসা স্বামীসোহাগিনী। বিশেষ সন্তান সন্ততি হইয়া সে সোহাগ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। বৃদ্ধি হওয়ারই কথা। স্ত্রী-ধনে ধনবান, স্ত্রী-কল্যাণে অপরিমিত সুখ ভোগ হইলে, সে স্ত্রীর আদর কোথায় না আছে? স্ত্রীর অকৃত্রিম ভালবাসা আছে বলিয়াই স্ত্রী-ধনে অধিকার। রূপসীর সহ্য হইল না। রূপসীর চেষ্টা স্বামী-স্ত্রীতে মনোমালিন্য ঘটাইয়া নিজে সুখি হয়। বহুদিন হইতে চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না। মীর সাহেব রূপসীকে ভালবাসেন, যত্ন করেন, আদর করিয়া কাছে বসান, গান শুনেন। এ সকল কথা দৌলতন্‌নেসার কানে তুলিয়া দিয়াও তাঁহার মন স্বামীপদ হইতে টলাইতে পারিল না। তখন অন্য চাল আরম্ভ করিল। অর্থ সহায়ে সাহায্যকারীও জুটিয়া গেল।

দৌলতননেসা রূপসীর কথা অনেকের মুখেই শুনিতেন। তাঁহার সেই পূর্ব্ব ভাব, পূর্ব্ব কথা। রূপসীর মনে এই কথা যে, মীর সাহেব-দৌলতন্‌নেসায় যেরূপ অকৃত্রিম প্রণয়-ভাব বর্ত্তমান তাহা ভংগ করা। সাধ্য কি? রূপসীর সাধ্য কি সে দাম্পত্য প্রণয়বন্ধন শিথিল করে। সে পবিত্র প্রণয়ভাবের পরমাণু অংশ বিনষ্ট করাও রূপসীর সাধ্য নহে। তবে একমাত্র উপায় দৌলতন্‌নেসাকে কোন কৌশলে জগৎসংসার হইতে সরাইতে পারিলে আশা বৃক্ষে সুফল ফলিবার কথঞ্চিত পরিমাণ আশা জন্মে। তাহা না পারিলে আর আশা নাই। এতদিন পরিশ্রম করিয়াও যখন কৃতকার্য হইতে পারে নাই, সে প্রণয়বন্ধন সমূলে বিচ্ছিন্ন করা দূরে থাকুক; সামান্যভাবে বিচ্ছিন্ন করিতেও সাধ্য হয় নাই। তখন ঐ সোজা পথই রূপসীর মনোরথ সিদ্ধির উপায়। এই সিদ্ধান্তেই মনে মনে আঁটিয়া আসরে নামিয়াছেন। সাহায্য জুটিয়াছে। অর্থের অসাধ্য কি আছে? অনুগত এবং ভালবাসার লোকই যে গোপনে গোপনে এই সাংঘাতিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে, ইহা মীর সাহেব স্বপ্নেও কখন চিন্তা করেন নাই। কোন দিন কোন কারণেও কথা ভাবিবারও কোন কারণ ঘটে নাই। তিনি অকৃত্রিম ভক্তির সহিত স্বামী-পদসেবা করিয়া জীবন সার্থক মনে করিতেছেন। মীর সাহেব মনের সংগে ভালবাসিয়া, মনে মনে মহা সৌভাগ্য জ্ঞান করিতেছেন।

মানুষের ভাল, মানুষের উন্নতি, মানুষের প্রেম মানুষের চক্ষে দেখিতে পারে না। প্রণয় ভাব, বিশুদ্ধ প্রেম ভাব, পবিত্র লক্ষণ প্রায় লোকেরই চক্ষুশূল। রূপসীরই যে না হইবে আশ্চর্য্য কি। তাহাতে রূপসী শিক্ষিতা নহে, ধর্ম্ম ভাবে আকুলা নহে। মহাপাপে ভীতা নহে—ইহকালই সার। ইহকালই সকল। পরকাল পরের কথা। মরিলেই ফুরাইল। হিসাব নিকাশের ধার কে ধারে, কেই বা অদেখা ঈশ্বরকে ভয় করে। এইত রূপসীর মত, ইহাতে আর আশা কি।

বসীরদ্দীন সহচরীর অনুগত। চাকরের মধ্যেও দুই একটি সহচরীর আজ্ঞাবহ। অথচ তাহারা দৌলতননেসার বেতনভোগী, দৌলতননেসার অন্নে প্রতিপালিত। বসীরদ্দীনের অন্নের সংস্থানও দৌলতননেসার অর্থে—তবে মীর সাহেবের হস্তে এই মাত্র প্রভেদ। দৌলতন্‌নেসার খাস দাসী চার জন। তাহার এক জনের নাম সবজা। দুর্গতী, হুরণ, নুরণ, চাম্পা, এই চার জন সর্ব্বদা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে তাঁহার সম্মুখে থাকিত। ফয়ফরমাস ইত্যাদি কার্য করিত। দৌলতননেসা ইহাদিগকে অন্য অন্য দাসী অপেক্ষা ভাল বাসিতেন, বিশ্বাসও করিতেন। ইহারা চার জন বাড়ীর বাহির হইত না। সবজা বৃদ্ধা, বাহির বাটীর মধ্যে সকল সময় সর্ব্বস্থানে সমান ভাবে যাওয়া আসা করিত। সবজার সহিত রূপসীর খুব আলাপ। রূপসীর সহিত সবজার অনেক সময় দেখা হয়, গোপনে অনেক কথাবার্তাও হইয়া থাকে। এই

সব্জাই সহচরীর সাহায্যকারিণী। মীর সাহেব শালঘর কুঠিতে গিয়াছেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আসিবার কথা। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল আসিলেন না। বৈঠকখানায় নিয়মিতরূপে আলো জ্বলিল। বিছানা, বালিশ পরিষ্কার হইল প্রতিদিন যে যে নিয়মে বৈঠকখানার কার্য্য চাকরেরা করে তাহা করিল। রূপসী ও বসীরুদ্দীন নিয়মিত চাকুরী বাজাইতে বৈঠকখানায় আসিয়া জুটিল। মীর সাহেব অবশ্যই আসিবেন। যতক্ষণ না আসেন ততক্ষণ কি করা? গান বাজনা করিতে সাহস হইল না। উভয়ে তাস খেলা করিতে বসিলেন।.. "সুধু বসে থাকাও ত মহা দায়। তুমি একটী গান গাও আমি আস্তে আস্তে সংগত করি।".....

"বাবা সে আমার দ্বারা এখন হইবে না। মীর সাহেব না আসিলে বৈঠকখানায় গান বাজনা করে কার সাধ্য; এতেই সকলে চটা। বাড়ী শুদ্ধ লোক আমাকে দেখতে পারে না, কেবল বিবি সাহেবের জন্যই রক্ষা। এমন মেয়ে হয় নাই। এ কালে কেউ দেখে নাই। বাপ্‌রে বাপ্! তারই সকল, তারই বাড়ী, তারই বৈঠকখানা, ভাব দেখি সে কেমন মেয়ে?"

"সেকি আর বলতে। আচ্ছা তুমি বস, আমি বাড়ী হতে একেবার ঘুরে আসি—" স্ত্রী মূর্ত্তি দুই এক পায়ে ঘরে প্রবেশ করিল। রূপসী তাড়াতাড়ি যাইয়া দ্বার বন্ধ করিলেন। ফিরিয়া আসিতেই স্ত্রী মূর্ত্তির অঞ্চল ধরিয়া ফরাসের নিকট টানিয়া আনিলেন। স্ত্রী মূর্ত্তিটী বাড়ীর লোক, বয়সও বেশী—দৌলতন্‌নেসার পরিচারিকা দুর্গতীর মাতা, নাম সব্জা। মুন্সী জেনাতুল্লার খরিদা। সবজা যে সময় খরিদ হইয়াছিল, সে সময় উত্তর অঞ্চলে দাসী বিকি কিনিতে দোষ ছিল না। বাড়ীর দাসী মাত্রেই ঐরূপ খরিদা। তাহাদের পেটে সন্তান-সন্ততি হইয়াছে—সব্জার পেটের মেয়ে দুর্গতী। দৌলতন্-নেসার চারিজন খাস পরিচারিকার মধ্যে একজন দুর্গতী।—তাহাতে সব্জার একটু আদরও আছে। মেয়ে মহলে সকলে একটু ভয় করে। ... ...

"কি কৌশল, কি উপায়ে খাওয়াইতে হইবে তাহা ত মনে আছে?"

"তা বেশ মনে আছে। শিকড়টীও কএক দিনে বেশ শুকাইয়া গিয়াছে। গুঁড়ো করতে আর বেশী মেহনত লাগবে না। দেখ ঐ শিকড়ের গুঁড়ো খাওয়ান ছাড়া আর কিছু পারবো না। আর যা দিয়েছ—তা আমি কখনই খাওয়াতে পারবো না।—আমার প্রাণ থাকতে পারবো না।"

"আচ্ছা, শিকড়টীতে গুঁড়ো করে কোন খাদ্য সামগ্রী মধ্যে মিশিয়ে খাওয়াতে পারবে?"

"হুঁ—পারবো। —আর যা বলিলে তা কিন্তু দিবে।"

"কি বলিলাম?"

"ঐ যে বলিলে, আরও কিছু--"

"তোমার মাথায় হাত দিয়ে বলিতেছি—যে দিন শুনিব, বিছানায় শুইয়া পড়িয়াছে, পেট চলিয়াছে, সেই দিন তোমাকে মনের মত খুসি করবো। বকশিশ ত ধরা রইল —"

সব্জা উঠিতে পড়িতে সাত পাক খাইয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে ঘরের বাহির হইল। রূপসী সব্জার পিছনে পিছনে আসিয়া পাশের দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। এবং সম্মুখের একটী দ্বারে খাড়া হইয়া পাল্কী দেখিতে লাগিলেন।

পঞ্চত্রিংশ তরংগ

হৃদয়ে আঘাত

দৌলতন্নেসা সেই যে পীড়িত শয্যায় পড়িয়াছেন, আর আরোগ্য লাভ করিতে পারেন নাই। দিন দিন পীড়ার বৃদ্ধি।...অনেকেই দৌলতন্নেসার জীবনে নিরাশ হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মাতার মনে দৃঢ় বিশ্বাস আছে, পীড়া আরোগ্য হইবে। এক ঘরের এক কন্যা, এক বংশের একটীমাত্র কন্যা। দৌলতন্নেসা অসময়ে জগৎ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন, এ কথা তাঁহার মনে একদিনের জন্যও ওঠে নাই! কিন্তু চক্ষের জলে সর্বদাই ভাসিতেছেন!...মীর সাহেব পুরুষ, কিছুদিন স্ত্রী-বিয়োগ দুঃখ মনে থাকিতে পারে। কিন্তু মুন্সীর বিবির আর কল্যাণ নাই। ভালাই নাই। এমন রোগ কেউ কখনও দেখে নাই। হায়! হায়। ছোট দুটী ছেলেরই বা কি দশা হইবে। হাজার বিষয় থাক, টাকা থাক, কিন্তু মায়ের সমান যত্ন, মায়ের সমান ভালবাসা কি আর হয়?...ছয় মাস যায়, পীড়ার বৃদ্ধি ব্যতীত হ্রাস হইল না। আজ আরও বৃদ্ধি! কি ভয়ানক বিষয়! উহু! বলিতে হৃদয় কাঁপিয়ে উঠে, অংগ শিহরিয়া যায়, অন্তরের অন্তঃস্থান পর্যন্ত আঘাত লাগে। হায়রে হিংসা। হায়রে আমোদ। নর্তকীসহ একত্র আমোদ! আজ দৌলতন্নেসার নাড়ী পচিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ পড়িতেছে। চিকিৎসকগণ নিরাশ হইয়া মলিন বদনে বাহিরে আসিলেন। মীর সাহেব কবিরাজদিগের হাবভাব দেখিয়া বুঝিয়া অবস্থা শুনিয়া সজল নয়নে স্ত্রীর পীড়িত শয্যার এক পার্শ্বে গিয়া বসিলেন। দেখিলেন, সে জলন্ত জ্যোতিঃ পূর্ণ সুকোমল মুখমণ্ডলে পূর্ব্বভাব পরিবর্ত্তন হইয়া, গত কল্য যাহা ছিল, তাহাও আজ নাই। সে বিস্ফারিত লোচনে খরতর জ্যোতিঃর অভাব যে পরিমাণ কাল দেখিয়াছিলেন, আর তাহার কিছুই নাই। সরল নাসিকা বামে

কিঞ্চিৎ হেলিয়াছে, চক্ষের জলে চিবুকদ্বয় ভাসিয়া যাইতেছে। পদতলে মাথা রাখিয়া সজল নয়নে মায়ের মুখ পানে চাহিয়া রহিয়াছে। আর দুটী পুত্র তাহারা অতি শিশু, তাহারা সেখানে নাই। স্থানান্তরে দাসীদিগের তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে কিন্তু সময় সময় তাহাদের কান্নার রবও শোনা যাইতেছে। মীর সাহেব অনেকক্ষণ সহধর্ম্মিনীর মুখ পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কেমন বোধ হয়।

দৌলতন্নেসা কোন উত্তর করিলেন না। দক্ষিণ হস্ত উঠাইয়া ঈশ্বর উদ্দেশ্যে মাত্র তর্জ্জনী উত্তোলন করিয়া দেখাইলেন। কোন কথা স্বামীকে বলিলেন না। অধিকন্তু বস্ত্রদ্বারা আপন মুখ ঢাকিয়া ফেলিলেন। স্বামীর পদ দুখানি দুই হাতে ধরিয়া অস্ফুট স্বরে কি বলিলেন, তাহা অপর কেহই বুঝিতে পারিল না। মীর সাহেব কিছুতেই তিষ্ঠিতে পারিলেন না। নীরবে ক্রন্দন করিতে করিতে বাহির হইলেন। কোন দিন কোন লোকে যে চক্ষে জল দেখে নাই, তাহারা আজ মীর সাহেবের চক্ষে অবিশ্রাম জলধারা পতন দেখিল।...

মীর সাহেবের অভিমতে তাঁহার পিতার সমাধিস্থানের নিকট দৌলতন্নেসার সমাধিস্থান নির্ণয় হইল। তাহাতে সাগোলাম কোন আপত্তি করিলেন না। সাঁওতার বাড়ী ঘর, জমীদারী, সে সময় সকলি সাগোলামের। মীর সাহেবের কোনো স্বত্ব নাই। কিন্তু দৌলতন্নেসার সমাধি সাঁওতায় হইতে সাগোলাম কোনো আপত্তি করিলেন না। এত দিনের পর রূপসীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। রূপসীর প্রসঙ্গ পথিক এ কলমে আর আনিবে না। তবে তাহার পরিণামফল পরিণামফলের সহিত জগৎকে দেখাইতে ইচ্ছা রহিল।